ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

সংখ্যা ২৫ (১৪২৪ বঙ্গাব্দ)

বাঙালির আত্মপরিচয়, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ভাষা আন্দোলন
পথনাটকে একুশের চেতনা
চলনবিল অঞ্চলের গঠন ও উৎপত্তি
কৈবর্ত জাতিবর্গের আত্মপরিচয়
পটুয়াখালীর উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বঙ্গদেশ
বাংলাদেশের গারো জনগোষ্ঠীর অভিবাসন প্রক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি
বাংলাদেশে মণিপুরি মৈতৈ ভাষার কবিতার বিষয়-বৈচিত্র্য
শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদের উডএনগ্রেভিং ছাপাই ছবি
গ্রাম পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ : কুষ্টিয়া জেলা
তাফসির চর্চায় মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর অবদান

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল (বাংলা), সংখ্যা ২৫ (১৪২৪ বঙ্গাব্দ)
প্রকাশকাল: জুন ২০১৮

© ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ ২০১৮

প্রকাশক
মোঃ জিয়াউল আলম
সচিব (ভারপ্রাপ্ত)
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মুদ্রক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

কভার ডিজাইন
আবু তাহের বাবু

মূল্য: ২০০.০০ টাকা

Journal of the Institute of Bangladesh Studies (Bangla), volume 25 (1424 bs). Edited by Swarochish Sarker, Director of the Institute of Bangladesh Studies. Published by Md. Ziaul Alam, Secretary of the Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, Bangladesh. Published in June 2018. Price: Tk 200, US $ 10

ISSN 1561-798-X

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নালের সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক
স্বরোচিষ সরকার
অধ্যাপক ও পরিচালক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সহযোগী সম্পাদক
জাকির হোসেন
অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য
তারিক সাইফুল ইসলাম
অধ্যাপক (অবঃ), অর্থনীতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

চিত্ত রঞ্জন মিশ্র
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এফ এম মাসউদ আখতার
অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এম. জয়নূল আবেদীন
অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ নাজিমুল হক
অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এম মোস্তফা কামাল
সহযোগী অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ কামরুজ্জামান
সহযোগী অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধের বক্তব্য, তথ্য ও অভিমতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী বা ইনস্টিটিউট দায়ী নয়

যোগাযোগের ঠিকানা
সম্পাদক, আইবিএস জার্নাল
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ ৬২০৫

ফোন: ০৭২১-৭৫০৯৮৫
ফ্যাক্স: ০৭২১-৭১১১৮৫
ই-মেইল: jibs@ru.ac.bd

সূচিপত্র

তাজিন এম. মুরশিদ ৭
বাঙালির আত্মপরিচয়, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ভাষা আন্দোলন

মলয় ভৌমিক ৩৫
পথনাটকে একুশের চেতনা

মোঃ আকরাম হোসেন সরকার ৪৫
চলনবিল অঞ্চলের গঠন ও উৎপত্তি

নিবেদিতা রায় ৫৭
কৈবর্ত জাতিবর্ণের আত্মপরিচয়

মোঃ আসাদুজ্জামান ৭১
পটুয়াখালীর উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

জি. এম. মনিরুজ্জামান ৮৫
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বঙ্গদেশ

মোহাম্মদ নাজিমুল হক ৯৩
বাংলাদেশের গারো জনগোষ্ঠীর অভিবাসন প্রক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি

ফারজানা সিদ্দিকা ১০৫
বাংলাদেশে মণিপুরি মৈতৈ ভাষার কবিতার বিষয়-বৈচিত্র্য

মোঃ আবদুস সোবাহান ১১৫
শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদের উডএনগ্রেভিং ছাপাই ছবি

মোঃ আরিফুর রহমান ১২৭
গ্রাম পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ : কুষ্টিয়া জেলা

আবু নোমান মুহাম্মদ মাসউদুর রহমান ১৪৫
তাফসির চর্চায় মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর অবদান

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
সংখ্যা ২৫ (১৪২৪ বঙ্গাব্দ)

শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদের উডএনগ্রেভিং ছাপাই ছবি

মো. আবদুস সোবাহান*

Abstract: Artist Safiuddin Ahmed (1922-2012) is one of the most prominent printmakers who have endeavoured to achieve the international standard of the Printmaking by applying his own uniqueness on Wood-engraving in Bangladesh. He is the progenitor of modern Printmaking, pioneer and iconic teacher of Bangladesh. He achieved significant dexterity in Wood-engraving techniques at 1940's when he was attending 'The Kolkata Government School of Art.' Majority of his Wood-engraving Printmaking Artworks express native tradition, social phenomena, nature, and semi-abstract art trend. A new trend of art is created by mixing the modern techniques along with the ancient Wood-engraving techniques of printmaking in Bangladesh.

সূচনা

বাংলাদেশের ছাপাই ছবি আন্দোলনের কিংবদন্তী শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদ। 'কলকাতা গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট' থেকে চারুবিদ্যায় শিক্ষা সম্পন্ন করে চল্লিশের দশকের শেষপ্রান্তে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সহকর্মী হিসাবে এদেশে চারুকলা শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করেন। আর্ট স্কুলে সূচনালগ্ন থেকেই গ্রাফিক্স (Graphics) শাখায় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। Graphics-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, একাধিক ছাপ, মুদ্রণ বা প্রতিরূপ ছবি। যা প্রিন্টমেকিং (Printmaking) পরিভাষায় শিল্পসভায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রিন্টমেকিং বা ছাপচিত্র বা ছাপাই ছবির একটি পরিশীলিত প্রকরণ হচ্ছে উড-এনগ্রেভিং। একটি পরিতল থেকে আরেকটি পরিতলে যেসব বিশেষ প্রক্রিয়ায় কাগজ বা কাপড় পরিতলে ছাপ নেওয়া হয় তাকেই সাধারণত ছাপচিত্র বা ছাপাই ছবি বলা হয়ে থাকে। সাধারণত চার প্রক্রিয়ায় ছাপচিত্র নির্মাণ হয়ে থাকে, যেমন: রিলিফ (Relief) বা উদ্‌গত, ইন্টাগ্লিও (Intaglio) বা অন্তর্লীন, প্লেনোগ্রাফি (Planography) বা পরিতল এবং স্টেনসিল, সেরিওগ্রাফি বা সিল্ক-স্ক্রিন (Stencil, Serigraphy or Silk-screen)। রিলিফ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত উডএনগ্রেভিং একটি আকর্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে বিশ্বশিল্পসভায় সমধিক পরিচিত। উড-এনগ্রেভিং চিত্র ছাপাইয়ের প্রাচীনতম প্রক্রিয়া হলেও সমকালীন অনেক ছাপাই শিল্পী এই প্রকরণে শিল্পচর্চা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তার মধ্যে আমাদের বাংলাদেশের খ্যাতিমান শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদ কলকাতার চারুবিদ্যালয়ে শিক্ষানবীশকালে এই কৃৎকৌশলে অকল্পনীয় পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। উডএনগ্রেভিংয়ে শুধু সাদাকালোতে চিত্র ছাপাই হয়ে থাকে। শিল্পী সফিউদ্দীনের চিত্রকর্মের বিষয়বস্তুতে স্থান করে নেয় পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়ভূমির জনপদের সাঁওতাল পল্লির বাস্তবধর্মী জীবনচিত্র

---

* সহযোগী অধ্যাপক, চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানবকুলের বৈচিত্র্যময় জীবনধারার সমাজচিত্র। তাঁর উড-এনগ্রেভিং কৌশলে নির্মিত ছাপাই ছবির বিষয়বৈচিত্র্যের স্বকীয়তা, আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য, দেশজ ঐতিহ্যের শিল্পধারা সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী আলোকপাত করা হবে এই প্রবন্ধে।

এক. উড-এনগ্রেভিংয়ের প্রায়োগিক কৌশল বিশ্লেষণ

ছাপচিত্রকলার একটি উল্লেখযোগ্য শৈল্পিক পদ্ধতি হলো 'রিলিফ'। 'রিলিফ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সমতল থেকে উঁচু বা উদ্ভিন্ন করে কোনো কিছু তৈরি করা। তবে চিত্র ছাপাইয়ের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ভিন্নতর। অর্থাৎ সমতল থেকে নীচু অংশ কেটে উদ্ভিন্ন করে চিত্ররূপের ব্লক ফুটিয়ে তোলা। যেমন: যে কোনো মসৃণ ও সমতল কাঠ বা রাবারের উপরিতলে অংকনকৃত নকশা, চিত্রের মূল রেখাংশ রেখে বিশেষত চিত্ররূপের সাদা অংশ বিভিন্ন ধরনের বাটালি, ছুরি বা নরুন নামক ধারালো যন্ত্র দ্বারা কেটে, চেছে বা খোদাই করে তুলে ফেলার পর চিত্রের যে অংশ উদ্ভিন্ন থাকে এবং রোলারের সাহায্যে প্রেস কালি বা রঙ লাগালে কেবল সেই অংশেই রঙ লাগবে এবং ছাপার সময় সেই অংশেরই হুবহু প্রতিরূপ কাগজে উদ্ভাসিত হবে। অর্থাৎ এভাবে তৈরিকৃত বন্ধনী বা 'Block' হচ্ছে 'Relief'. ছাপচিত্রের পরিভাষায় এই প্রক্রিয়াকেই 'রিলিফ' বা নতোন্নত বা উদ্‌গত পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে। অন্ধকার ও আলোকে উজ্জ্বলতরভাবে কাগজে পরিস্ফুটিত করাই হচ্ছে এই পদ্ধতির প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই রিলিফ পদ্ধতির অন্যতম মাধ্যম হলো উড-এনগ্রেভিং (woodengraving). 'Engrave' শব্দের মূল উৎস গ্রিক শব্দ 'Grapho, I cut.'[১] এবং ল্যাটিন শব্দ 'Scribo' অর্থাৎ 'I write' বা আমি লিখি থেকে। সম্ভবত 'Scribo' থেকে 'to Scrive' শব্দের উৎপত্তি। যদিও বিভিন্ন দেশের ভাষায় এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রকাশ পেয়েছে। তদুপরি, ইংরেজি 'to engrave' বা খোদাই করা এবং যিনি খোদাই করেন তাঁকে 'Engraver' বলা হয়ে থাকে। সর্বোপরি বলা যায়, ইংরেজি 'Engraving' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো খোদাইকৃত প্লেট বা ব্লক অথবা কাঠ, কপার, জিঙ্ক, স্টিল, প্লাস্টিক ইত্যাদি যে কোনো খোদাইকৃত পরিতল থেকে একাধিক ছাপ নেওয়ার প্রক্রিয়া।

সাধারণত 'ক্রস সেকশন' (Cross section) বা আড়াআড়িভাবে কর্তনকৃত কাঠের প্রান্তসীমার ঘন আঁশ (End-grain) সন্নিবেশিত কাঠের মসৃণ উপরিতলে নরুনের সাহায্যে গভীরভাবে খোদাই করে ব্লক তৈরি করে যে ছাপ কাগজে বা কাপড়ে উদ্ভাসিত করা হয় তাকেই উডএনগ্রেভিং বলা হয়। উডএনগ্রেভিংয়ের জন্য মূলত শক্তকাঠ (hard wood) ব্যবহৃত হয়। উডএনগ্রেভিং সাধারণত বড় আকারের হয় না। কালো রঙের উপর সাদা রেখার বৈচিত্র্যময়তা ফুটিয়ে তোলাই এর অনন্য প্রধান বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ এর Basic principle হলো 'white play on black'. সূক্ষ্ম কাজের জন্য উডএনগ্রেভিং মাধ্যম উৎকৃষ্ট। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা যায়: 'As soon as This change commenced, wood engraving as a means of multiplying works of art began to decline.'[২] ঐতিহ্যগতভাবে এনগ্রেভিংয়ে নরুন নামক এক ধরনের যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ করেন গোল্ডস্মিথ (Goldsmiths) এবং গ্লাস খোদাইকারী গানস্মিথ (Gunsmiths) এবং অন্য সতীর্থরা।। প্রথমদিকে পাথর, ধাতুপাত ও কাঠে নকশা বা চিত্র খোদাই প্রক্রিয়া শুরু হয়। এক সময় গ্রন্থ

---

[১] John Jackson, *A Treatise on Wood Engraving* (London: Published by Gale Research Company, 1969), p.2.

[২] তদেব, পৃ. ৬৫১।

সচিত্রকরণের প্রয়োজনেই এসব পরিতলে খোদাই প্রক্রিয়ায় ব্লক তৈরি করে ছাপার প্রচলনের উত্তরণ ঘটে।

সাধারণত উড-এনগ্রেভিংয়ের জন্য যে সমস্ত কাঠ ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তা নিম্নরূপ: হার্ডউড সাধারণত প্রশস্ত (Broad) 'leaved trees' কাঠের কাণ্ড থেকে পাওয়া যায়। এই গাছের কাণ্ডকে ক্রস সেকশন বা ডোম বা চাক আকৃতিতে কাটা হয়, ফলে এর কাঠের রঙ বৃত্তাকার ধারণ করে যা, রিংক বা আংটির সদৃশ দেখায়। সাধারণত যেসব কাঠের পাতা অপেক্ষাকৃত বড় এবং চেপ্টা আকৃতির সেসব বৃক্ষের কাঠ শক্ত হয়ে থাকে। শক্ত কাঠের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চেরি (Cherry), পিয়ার (Pear), ওক (Ock) এবং অ্যাপেল (Apple) এছাড়াও লাইম (Lime) বা লিনডেন (Linden), বিচ (Beech), চেস্টনাট (Chestnut), ম্যাপেল (Mapple), ওয়াইলো (Willow) এবং হেলডিউ (Haldu) অন্যতম হলেও মূলত উডএনগ্রেভিং মাধ্যমে ব্লক তৈরির জন্য সর্বোৎকৃষ্ট হলো বক্সউড (Boxwood) এবং হলিউড (Hollywood)। এ সমস্ত কাঠের কাণ্ডকেও ক্রস সেকশন বা আড়াআড়িভাবে কাটা হয়। 'A block which has been prepared by sawing across the grain is known as an 'end-grain block', and is chiefly associated with the technique of wood evgraving.'[৩] যার ফলে আঁশগুলো খুবই ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকে। একই সঙ্গে মসৃণ, বুনট সমন্বিত হওয়ার কারণে সূক্ষ্ম রেখার কাজ করতে শিল্পীরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে থাকেন। সাধারণত বিশেষভাবে শক্ত স্টিল দিয়ে তৈরিকৃত এক ধরনের বিউরিন হাতিয়ার উড-এনগ্রেভিং কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়ে থাকে। এর ইংরেজি নাম হলো 'Graver'. স্টিল বা ইস্পাত দিয়ে তৈরি এই বিশেষ ধরনের হাতিয়ার বিউরিন বা নরুন সাধারণত চার ধরনের হয়ে থাকে। যেমন: গ্রেভারস (Gravers), টিন্ট টুল্স (Tint-tools), বাটালি বা বুলি অথবা স্কোরপার (Scorpers) এবং ফ্লাট টুল্স (Flat tools) অথবা চেসেলস (Chisels). এসব হাতিয়ার আবার বিভিন্ন আকার ও আকৃতির হয়ে থাকে। যেমন: লজেন্স (lozenge) বা গ্রেভারস টুল্স (Gravers tools), স্ট্যান্ডার্ড গ্রেভার (Standard graver), স্কয়ার গ্রেভার (Square graver), টু লাইনিং গ্রেভারস (Two liming gravers) এবং টিন্ট গ্রেভারর্ড (Tint gravered) বিশেষভাবে কাজ উপযোগী।

শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদ এই উড-এনগ্রেভিং প্রক্রিয়ায় চল্লিশের দশকে পারদর্শিতা প্রর্দশন করেন। তিনি উড-এনগ্রেভিং কৌশলে নানামুখী টুলস, বেঞ্চ-হুক ও স্যান্ডব্যাগ ব্যবহার করেছেন। সাধারণত তুলট জাতীয় এক ধরনের কাগজই তিনি ব্যবহার করেছেন। যেমন উল্লেখ করা যায়, বাটার পেপার (Butter paper), টিস্যু পেপার (Soft tissue) ইত্যাদি। এই দশকে তাঁর উড-এনগ্রেভিং তিনটি দাবিকে পূরণ করেছিলো। প্রথমত গণমানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য; দ্বিতীয়টি, ছাপচিত্র মাধ্যমের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে মনোবিকারে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অভিব্যক্তি প্রকাশের প্রয়োজন; এবং তৃতীয়টি সবচেয়ে পুরনো, তা হলো গ্রন্থপত্রে ইলাসট্রেশন মুদ্রিত করার কাজ। শিল্পী সফিউদ্দীন দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যে প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে সেই সময় তিনি গ্রাফিক্সের প্রথম সারির একজন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।[৪] উড-এনগ্রেভিংয়ের বিশেষত্ব হলো-কালো জমিনে বিষয়বস্তুর অবয়ব গড়নে সাদার বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য উদ্ভাসন এবং বহুমুখী নরুন প্রয়োগে কুশলী

---

[৩] Walter Chamberlain, *Manual of Woodcut Printmaking and related techniques* (London: Copyright Thames and Hudson Ltd, 1978), p. 62.

[৪] মইনুদ্দীন খালেদ, "সফিউদ্দিন : শুদ্ধতম ঋত্বিক", *বাংলাদেশের চিত্রশিল্প* (ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ, ২০০০), পৃ. ৩৭। (লেখক এখানে সফিউদ্দীন-এর বানানে সফিউদ্দিন লিখেছেন।)

দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের বহিঃপ্রকাশ একই সঙ্গে 'উড-এনগ্রেভিংয়ে রেখা হয়ে ওঠে অনেক বেশি সূক্ষ্ম, জটিল ও গতিশীল। এই মাধ্যমের চিত্রে বস্তুসাদৃশ্য রূপায়ণের আগ্রহে বর্ণবিভার আব (টোনাল এফেক্ট) সৃষ্টির চেষ্টাও থাকে।'[৫] শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদ তাঁর উড-এনগ্রেভিং ছাপাইকর্মে এর যথার্থ প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়েছেন।

দুই. কলকাতায় অবস্থানকালীন উড-এনগ্রেভিং ছাপাই ছবির বিশ্লেষণ

একজন আধুনিক শিল্পী মানস বৈশিষ্ট্যের মতো শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদের মধ্যেও রয়েছে বিষয়বস্তুকেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনা। আর্ট স্কুলের ছাত্রাবস্থা থেকেই ছিলেন বাস্তবদর্শী ও সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ। এই ভাবনার স্ফুরণ ঘটে আর্ট স্কুলের অগ্রজদের কাজের ধারা, নব্য-বঙ্গীয় ধারায় সৃষ্ট চিত্রভাষার গভীর পর্যবেক্ষণ এবং একই সঙ্গে পাশ্চাত্য শিল্প ও ভারতীয় স্বকীয় শিল্পভাষার মধ্যে ভাঙাগড়ার সুর ব্যঞ্জনায়। তবে তিনি কখনোই এই পদ-চারণায় নিজেকে পুরোপুরি সম্পৃক্ত করেননি। সর্বদা নিজস্ব শিল্পচেতনার ভাষাকে বাস্তবধর্মী ও শৈল্পিক মেজাজে রূপদানে ছিলেন উন্মুখ।

> তিরিশের দশকের শেষে এবং চল্লিশের দশকের শুরুতে উপমহাদেশের কলকাতাকেন্দ্রিক আধুনিক চিত্রধারা বাস্তববাদী রীতির বহুভঙ্গিম প্রকাশে অভূতপূর্ব সমৃদ্ধির স্পর্শ পায়। প্রতিকৃতিচিত্র, নিসর্গচিত্র, গেরস্থালি-জীবনচিত্র সবকিছুর মধ্যে আবেগের নতুন চাড় লাগে। বেঙ্গল স্কুলের মেদুর পর্দা সরিয়ে নিজস্ব মনোবিকারে ও সময়ের কাঙ্ক্ষিত আবেদনে সাড়া দিয়ে শিল্পীরা ছবি আঁকতে থাকেন।[৬]

কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলে ব্রিটিশ একাডেমিক রীতির বাস্তবধর্মী অনুশীলনে চিত্রের বাস্তব গড়নে নিজস্ব শিল্পশৈলীর অন্বেষন করেছেন শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদ। তিনি এ সময় এক্সপ্রেশনিস্ট ও ইমপ্রেশনিস্টের দোলাচলে শৈল্পিক মনোজগতকে উজ্জীবিত করে চিত্র রচনায় উদ্বেলিত হন। কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি ছাপচিত্রের অন্যান্য কৌশলে শিল্পচর্চা করলেও মূলত উড-এনগ্রেভিং প্রকরণে চরম উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন। কলকাতা শহরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক জীবনযাত্রার যুদ্ধোত্তর কলকাতার অস্থির সমাজ ব্যবস্থা, কলকাতা শহরময় দুর্ভিক্ষ, হাহাকার সমাজ কাঠামোর অবমূল্যায়ন ও মূল্যবোধের ক্ষরণ তাঁর অন্তরকে বিদীর্ণ করেছিলো। তাই এই বিপন্ন অবস্থার গ্লানি থেকে নিজেকে মুক্ত এবং সৃজনকর্মকে আরো পরিশীলিত করতে অর্জিত শিক্ষাকে পুঁজি করে বেরিয়ে পড়লেন পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল পরগণার রাঢ় জনপদ 'দুমকা' অঞ্চলে। এ সময় সাঁওতাল মানব-মানবীর ক্লিষ্টময় জীবন অথচ তাদের সারল্য ও প্রশান্তময় বহিঃপ্রকাশ তাঁর শিল্প সৃষ্টির নতুন দ্বারকে উন্মোচিত করেছিলো। 'দুমকায় গিয়ে সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনের অনুষঙ্গ আবিষ্কার করলেন। কোনো জটিলতা নেই, কোনো অসঙ্গতি নেই, সাঁওতালদের শ্রম ও সারল্য তাঁর ছবিতে মহাজীবনে শরীক হলো।'[৭] ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়নকালে যাত্রা শুরু করেন বিহারের সাঁওতাল এলাকার মধুপুরে, যা অব্যাহত ছিলো ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। উঁচু-নীচু, ভূমি, পাহাড় আর বৃক্ষরাজির সুষমামণ্ডিত সৌন্দর্যের নির্যাস খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ ও অবলোকন করেছেন। এ সময় সাঁওতাল পল্লির সহজ-সরল জীবনযাত্রা, শান্ত পরিবেশ তাঁকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছিলো। প্রকৃতি ও মানুষের এরূপ জীবনযাত্রা অবগাহনের বহুবিধ অনুষঙ্গকে তাৎক্ষণিক স্কেচে কখনো জলরঙে কখনো পেন্সিল, কালি ও কলমে চিত্রায়িত করেছেন। পরবর্তীকালে এসব

---

[৫] সৈয়দ আজিজুল হক, *সফিউদ্দীন আহমেদ* (ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশন লিমিটেড, ২০১৩), পৃ. ৩৬।

[৬] মইনুদ্দীন খালেদ, "সফিউদ্দিন : শুদ্ধতম ঋত্বিক", *বাংলাদেশের চিত্রশিল্প*, পৃ. ৩৬। (লেখক এখানে সফিউদ্দীন-এর বানানে সফিউদ্দিন লিখেছেন।)

[৭] মাহমুদ আল জামান, "পরিপূর্ণ এক শিল্পী মানুষ", *সফিউদ্দিন আহমেদ* (ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০২), পৃ. ৪০। (লেখক এখানে সফিউদ্দীন-এর বানানে সফিউদ্দিন লিখেছেন।)

বিষয়বস্তুর স্কেচকে অবলম্বন করেই উডএনগ্রেভিং প্রক্রিয়ায় ছাপাই করেছেন অসাধারণ শিল্পসম্ভার। প্রতিটি চিত্রকর্মেই একাডেমিক ধাঁচ এবং বাস্তবধর্মী আলোছায়ার গড়ন সুদক্ষতায় উদ্ভাসিত। এই দশকেই বিষয়বৈচিত্র্য, নিপুণ ড্রইং, বলিষ্ঠ রেখা, স্পেসের বন্টন, বস্তুর গাঢ়তা, বর্তনা–এসবের সুষমবন্টনে ঐকতান সৃষ্টিতে মেতে ওঠেন। যার যথার্থ প্রয়োগ শিল্পীর 'দুমকা', 'সাঁওতাল রমণী ও সন্তান', 'কৃষক', 'বাকুড়া', 'পথে', 'কর্মস্থলের নিকট' 'কলকাতা আর্ট স্কুলের পুকুর', 'বাড়ির পথে' 'সাঁওতাল রমণী', 'বনের পথে', 'ঘরে ফেরা' প্রভৃতি চিত্রকর্মে লক্ষণীয়।

চল্লিশের দশকের প্রারম্ভে দুমকা অঞ্চলের রাঢ় জনপদের প্রকৃতি ও জীবনযাত্রা নিয়ে তিনি সর্বপ্রথম উডএনগ্রেভিং প্রক্রিয়ায় নির্মাণ করেন 'দুমকা' (১৯৪০) শীর্ষক চিত্রটি। এটি ৫.৬×৪.৬ সে. মি. আয়তনে আনুভূমিকে উপস্থাপিত। নরুনের নানামুখী প্রয়োগে স্বল্প পরিসরপটে দুমকা অঞ্চলের দৃশ্যরূপ কাঠের পরিতলে চিত্ররূপ খোদাই করে সাদাকালোয় ছেপেছেন। মেঠোপথ ধরে একজন পথিক হেঁটে যাচ্ছে গন্তব্যে পৌঁছার লক্ষ্যে। রাস্তার দুপাশে সারিবদ্ধ বৃক্ষ। মাঠ পেরিয়ে দিগন্তরেখায় কয়েকটি বাড়ি, নানা প্রকৃতির বৃক্ষ ও দূর আকাশ দৃশ্যমান। সাদাকালোয় চিত্রটিতে কিঞ্চিৎ আলোছায়া যোজিত হয়েছে (চিত্র ১)। সাঁওতাল জীবনযাত্রার অপর চিত্ররূপ ধরা পড়েছে তাঁর 'সাঁওতাল রমণী ও সন্তান' (১৯৪২) শীর্ষক চিত্রে। ১০×১৬ সে. মি. আয়তনের চিত্রটি আনুভূমিকে নির্মিত (চিত্র ২)। সাঁওতাল রমণীরা তাদের সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে কাজের সন্ধানে ক্ষেতের মধ্য দিয়ে মেঠোপথে যাত্রারত। তাদের কারো মাথায়, হাতে ও কোমরে প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী। তাদের সঙ্গে সন্তানরাও সমতালে হেঁটে যাচ্ছে। নরুনের দক্ষ প্রয়োগে সূক্ষ্ম রেখায়, ছোট-বড় বিন্দুতে দেহাবয়ব নিটোলভাবে গড়েছেন। রোদেলা আলোয় দেহাবয়বের ছায়া মেঠোপথে পড়েছে। মাঠ-প্রান্তর সরু ও মোটা ভঙ্গুর রেখায় উদ্ভাসিত। মাঠ পেরিয়ে দিগন্তরেখায় ঘর-বাড়ি, বৃক্ষরাজি কালো বর্ণে দৃশ্যমান। সৈয়দ আজিজুল হকের ভাষায় :' চিত্রটির মূল বৈশিষ্ট্য হলোঃ গতি। সেটা যেমন নারী-শিশুর চলনভঙ্গিতে স্পষ্ট তেমনি পথের দৃশ্যমানতায় আভাসিত। জীবনের গতিশীলতাকেই শিল্পী এ চিত্রে পরিস্ফুটিত করেছেন।'[৮] কলকাতার বাকুড়া অঞ্চলের গ্রামীণ বসতবাড়ির দৃশ্যপটও তাঁর চিত্রের বিষয়বস্তুতে উঠে এসেছে। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জাপানি বোমা নিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি হলে অনেকেই কলকাতা ত্যাগ করেন। এভাবে ১৯৪১-এর শেষ দিকে সফিউদ্দীন আহমেদও তাঁর মাসহ বাঁকুড়ায় এক খালাবাড়িতে গিয়ে মাসতিনেক ছিলেন। ১৯৪২-এর প্রথম দিকে, আর্ট স্কুলের চূড়ান্ত পরীক্ষার খবর পেয়ে, তিনি কলকাতায় ফেরেন। খালাবাড়ির দোতলায় বসে জানালা দিয়ে দেখা রাস্তা ও একটি বাড়ির প্রকৃতিসমেত দৃশ্য স্কেচ করেন তিনি।'[৯] এই স্কেচকে অবলম্বন করে তিনি 'বাকুড়ার নিসর্গ' (১৯৪২) চিত্রটি ১০×১৬ সে. মি. আয়তনে আনুভূমিকে নির্মাণ করেন। চৌচালা ঘর, গাছপালা, ভূমি ও আনুষঙ্গিক অন্য বস্তুসমূহকে নরুনের বিচিত্রগামী দক্ষ কৃৎকৌশলে সরু, ভঙ্গুর, ডট বা বিন্দুতে উদ্ভিন্ন করেছেন। ঘরের ছাউনী যে ছনগাছের শলা ও ঘরের দেয়াল যে মাটি দিয়ে নির্মিত সেটির চরিত্র এবং একই সঙ্গে প্রতিটি বৃক্ষরাজির স্বকীয় চরিত্রের যথাযথভাবে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। রোদের আলোয় প্রতিটি বস্তুর গড়ন আলোছায়ার নিটোল খেলায় মূর্ত হয়ে উঠেছে (চিত্র ৩)। কলকাতার হাওড়ায় কর্মব্যস্ত এলাকার চিত্ররূপ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন 'কাজের নিকটস্থান' (১৯৪৩) শীর্ষক চিত্রটিতে। এটি ১৬×১০ সে. মি. আয়তনে উল্লম্বভাবে উপস্থাপিত (চিত্র ৪)।

---

[৮] সৈয়দ আজিজুল হক, *সফিউদ্দীন আহমেদ* (ঢাকা : বেঙ্গল পাবলিকেশন লিমিটেড, ২০১৩), পৃ. ৩৭।
[৯] তদেব, পৃ. ৩৬।

কয়েকটি দালান-কোটা, ঘরবাড়ি পাশাপাশি অবস্থানে সন্নিবেশিত। চিত্রের সম্মুখে কলাগাছ ও পেছনের গাছপালার অবস্থান এতে দৃশ্যমান। নরুনকে খাড়া ও আড়াআড়িভাবে প্রয়োগ করে প্রতিটি বস্তুর গড়ন পরিস্ফুটনে প্রয়াসী হয়েছেন। কাঠের মসৃণ পরিতলে সরু, মোটা, বিন্দু, ভঙ্গুর রেখায় চিত্ররূপ পরিপুষ্ট খোদাইয়ে উদ্ভিন্ন করে সাদাকালোতে উদ্ভাসিত করেছেন। যাতে আলোছায়া আরো স্পষ্টতায় ফুটে উঠেছে।

চিত্র ১: শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদ, দুমকা, উডএনগ্রেভিং, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ

চিত্র ২: শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদ, সাঁওতাল রমণী ও সন্তান, উডএনগ্রেভিং, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ

চিত্র ৩ : শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদ, বাকুড়ার নিসর্গ, উডএনগ্রেভিং, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ

চিত্র ৪ : শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদ, কাজের নিকটস্থান, উডএনগ্রেভিং, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ

সাঁওতাল অধ্যুষিত দুমকা অঞ্চলের বৃক্ষরাজি ঘেরা প্রকৃতির সঙ্গে সাঁওতাল বালার পথযাত্রার দৃশ্যরূপ ফ্রেমবন্দি করেছেন 'বনপথে দুই সাঁওতাল রমণী ' (১৯৪৩) শীর্ষক চিত্রটিতে। ১৭×১০ সে. মি. আয়তনে চিত্রটি উল্লম্বভাবে নির্মিত। সারিবদ্ধ বৃক্ষরাজির মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে যাওয়া মেঠোপথে দুজন সাঁওতাল বালা মাথায় ডালির ভিতর বস্তুসামগ্রী নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। উভয়ের পরিধানে সাদা কাপড়, মাথার পেছনের চুলে ফুলগোঁছা। গাছের ফাঁক-ফোকড় দিয়ে রোদেলা আলো এসে পড়েছে মাটিতে, গাছের পাতা

এবং ঘাসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু ও ছোট-বড় ভঙ্গুর রেখার প্রয়োগ লক্ষণীয় (চিত্র ৫)। 'প্রকৃতির পটভূমিতে গভীর বনমধ্যে দুই মানবীর এই রূপ অঙ্কনের মধ্যে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে সময় ও স্থানকে অতিক্রম করে যাওয়ার চেষ্টা। এই পথচলার যেন কোনো শেষ নেই। যেন সমগ্র মানবকুলেরই অনিঃশেষ পথযাত্রার নিদর্শন এটি।'[১০]

সাঁওতাল পরগণার শেষ বিকেলের এক অপরূপ দৃশ্যের চিত্ররূপ ধরা পড়েছে তাঁর 'বাড়ির পথে' (১৯৪৫) উডএনগ্রেভিং মাধ্যমের চিত্রটিতে। ৯×১৯ সে. মি. আয়তনের ক্রস সেকশনে কর্তনকৃত শক্ত কাঠের ফালি আনুভূমিকে উপস্থাপন করে চিত্রটি গড়েছেন। 'মহাবিশ্বের পটভূমিতে আমরা মানুষসহ প্রাণিজগৎ যে কত ক্ষুদ্র মহাকাশতলে দাঁড়িয়ে মানুষ বারবার তা উপলব্ধি করে। শিল্পীও এই অনুভূতি নিয়ে রচনা করেছেন এই চিত্রকর্ম।'[১১] উঁচু-নীচু সমতল ভূমির ওপর তালগাছের সারিবদ্ধ সম্মিলন, একই সঙ্গে রাঙা মেঠোপথে কয়েকটি মানুষ ও পশুর সবান্ধব সচল যাত্রা। দুটি মহিষের পীঠে সাঁওতাল বালক উপবিষ্ট (চিত্র ৬)। সম্মুখ এবং সবচেয়ে পিছন দিকের বালকের মাথায় গোলপাতায় তৈরি ছাতা। আকাশছোঁয়া সারিবদ্ধ তালগাছ, মেঘযুক্ত আকাশ, ভূমির প্রান্তরেখা, নদীর জল, পশু, মানুষজনকে নরুনের বৈচিত্র্যময় প্রয়োগে কোথাও রৌখিক, কোথাও ভঙ্গুর রেখা কোথাও ডট বা বিন্দু, সরু, মোটা ও ছন্দায়িত রেখার সূক্ষ্মতায় খোদাই কৌশলে অন্তর্ভেদ করে সাদা নির্মল কাগজপটে কালো রঙে ছেপেছেন। এতে একজন দক্ষ এনগ্রেভারের পরিমিতিবোধ এবং একই সঙ্গে সৌন্দর্য পিয়াসীর পরিচয় মেলে তাঁর এই বাস্তবরূপী সৃজনকর্মে। মাহমুদ আল জামানের ভাষায়:

চিত্র ৫ : শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদ, বনপথে দুই সাঁওতাল রমণী, উডএনগ্রেভিং, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ

চিত্র ৬ : শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদ, বাড়ির পথে, উডএনগ্রেভিং, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ

> বিন্দুর পৌনঃপুনিক প্রয়োগে কয়েক সারি আনুভূমিক রেখায় ছবির পুরোভাগের তৃণভূমি ও শস্যক্ষেত। একটু পরে উত্তেলিত ভূমিরেখা, ভূস্পর্শ করে লম্বিক আকাশমুখী তালগাছ, তারপর দূরের প্রকৃতি স্তম্ভিত এবং সবশেষে মেঘ সঞ্চরণের আকাশ। এভাবে ছন্দের মর্মরধ্বনি শোনা

---

[১০] সৈয়দ আজিজুল হক, *সফিউদ্দীন আহমেদ*, পৃ. ৩৭।

[১১] তদেব, পৃ. ৩৮।

যায় 'বাড়ীর পথে' ছবিটিতে। কাজটি উড এনগ্রেভিঙে করা। কাঠের ব্যবচ্ছেদ করে যেন তার অন্তরের আঁশের সব কথা বের করে আনা হয়েছে বিভিন্ন অনুষঙ্গের ছন্দময় প্রকাশের তাগিদে।[১২]

সফিউদ্দীনের উডএনগ্রেভিংয়ের চরম উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়েছে 'সাঁওতাল রমণী' (১৯৪৬) শিরোনামের চিত্রকর্মে (চিত্র ৭)। ১৭×১০ সে: মি: আয়তনে উল্লম্বভাবে নির্মিত এই ছাপাইকর্মে সাঁওতাল পল্লীর দৈনন্দিক কর্মচাঞ্চল্য নারীর জীবনযাত্রার গতিধারার ভিন্ন চিত্ররূপ পরিস্ফুটিত হয়েছে । যৌবনবতী দু সাঁওতাল রমণীর দেহতন্বী রোমান্টিক ইমেজ দৃশ্যায়িত হয়েছে। পুকুরে হাঁটুর নীচ অবধি পানিতে এক তরুণীর কাঁখে কলসি ও মাথায় বেড়ীসমেত ঘট, কানে ঝুলন্ত দুল, হাতে চুড়ি, বাজুবন্ধ ও গলায় মাদুলি। চুলের খোপায় ফুল গোঁজা। শাড়ীর পাড়ে খাড়া টানে সূক্ষ্ম নকশা। নিটোল ভাঁজে কোমরে বাঁধা নকশি শাড়ীর আঁচল। প্রোফাইল মুখাবয়বে নীর্লিপ্ত চাহনি সঙ্গীর দিকে। সমগ্র দেহভঙ্গিতে একটা ছন্দায়িত মুদ্রার ক্রিয়ারূপ বিদ্যমান। মুখে, হাতে, আঁচল ও এক পাশের কোমর থেকে পা পর্যন্ত আলোকছটা উদ্ভাসিত। অপর তরুণীও বর্তুল দেহভঙ্গিতে কলসিতে পানি ভরছে নিমগ্নে। নকশাকৃত শাড়ীর আঁচল কোমরে বাঁধা। শাড়ী এমনভাবে পরিধান করেছে, যাতে পিঠের অনেকটা অংশ অনাবৃত। মাথার চুল, পিঠে, খানিক শাড়ীর আঁচল দুহাতে ও একটি হাঁটুতে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত আলো এসে পড়েছে। তার দেহভঙ্গির মুদ্রায় নাচের ছন্দ প্রকাশ পেয়েছে।

মূল বিষয়বস্তুর পশ্চাতে অর্থাৎ পুকুর বা খালের পাড়ের ভূমিতে বনানীর মেঠোপথে হেঁটে যাচ্ছে দুজন। একজনের মাথায় ছাতা। রোদেলা আলো গাছের ছায়া এবং তরুণীদের দেহভঙ্গির ছায়া স্বচ্ছ জলের মৃদু তরঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে, যাতে আলোছায়ার অপরূপশোভা দৃষ্টিনন্দন হয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে। নানামুখী নরুনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রয়োগে খালের কিনারে ছন্দায়িত ক্ষুদ্র রেখা আর ডট বা বিন্দু প্রয়োগে জলের আবহ, ঘাসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, গাছকে অল্প পরিসরে ক্ষুদ্র রেখায় এবং গাছের পাতাগুচ্ছকে সূক্ষ্ম রেখায় খোদাই কৌশলে উদ্ভিন্ন করেছেন শিল্পী। একই সঙ্গে তরুণীদ্বয়ের দেহশৈলীতেও বিচিত্র এবং বলিষ্ঠ ও গতিময় রেখা পরিস্ফুটনে নরুনের কুশলী প্রয়োগ বিদ্যমান। সমগ্র চিত্রে জোরালোভাবে আলোছায়ার নাটকীয় রূপবন্ধন যোজনায় ব্রিটিশ চিত্রকর বেউইক-এর শিল্পরীতির যথার্থ প্রতিফলন লক্ষণীয়। এই সাঁওতাল রমণীকে নিয়ে যে রোমান্টিকতার ছোঁয়া, যাতে জড়িয়ে রয়েছে এক অনাবিল সৌন্দর্যচৈতন্য। 'এই সৌন্দর্য চেতনায় নারীর শরীর নিয়ে কোনোই ভাবালুতা বা কোনো ভিন্ন আবেগ সৃষ্টি হয় না তাঁর ভেতর'।[১৩] যার প্রতিফলন আমরা পাই এই চিত্রের আঙ্গিকে। সাঁওতাল রমণীর শারীরিক চেহারার বর্ণ কালো হলেও তিনি কালো দেহাবয়বে ঢেলে দিয়েছেন লাবণ্যময় সৌন্দর্যের আভা। তাঁর এই চিত্রকর্ম প্রসঙ্গে চিত্র সমালোচক হারকোট রবার্টসন দৈনিক স্টেটম্যান পত্রিকায় লিখেছেন এভাবে: 'সফিউদ্দিনের সাঁওতাল রমণী, কেবল একটি রসপুষ্ট চিত্রই নয়, ইহা তাহার মহৎ শিল্পসম্পদের একটি রূপবান নিদর্শন'।[১৪] সৈয়দ আজিজুল হক এই চিত্রকর্ম সম্পর্কে লিখেছেন : 'সমগ্র চিত্রটির পটভূমিতে মেয়ে দুটিকে যেভাবে স্থাপন করা হয়েছে তাতে শিল্পীর

---

[১২] মইনুদ্দীন খালেদ, "সফিউদ্দিন : শুদ্ধতম ঋত্বিক", *বাংলাদেশের চিত্রশিল্প*, পৃ. ৩৭।

[১৩] মাহমুদ আল জামান, "পরিপূর্ণ এক শিল্পী মানুষ", *সফিউদ্দিন আহমেদ*, পৃ. ৩৮।

[১৪] *তদেব*, পৃ. ৬০।

বিরচনগত দক্ষ পরিকল্পনার ছাপও স্পষ্ট। মেয়ে দুটির দু-ধরনের ভঙ্গির মধ্যেও বিরচনের তাৎপর্যকে অনুধাবন করা যায়।'[১৫]

প্রত্যন্ত গ্রামীণ আবহের যাপিত জীবনযাত্রায় সাঁওতাল জনপদে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে অনেক জনমানবের মিলনমেলায় এক আনন্দঘন পরিবেশ সূচিত হয় বিশেষ কোনো মেলার আয়োজনে। এই মেলায় বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। তাঁর উড-এনগ্রেভিংয়ের অভিনব কৌশল প্রয়োগের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে 'মেলার পথে' (১৯৪৭) চিত্রকর্মে। 'চিত্রকর্মটি কত সূক্ষ্ম, গভীর ও তাৎপর্যবহ হতে পারে সেদিকেই ছিল শিল্পীর সজাগ দৃষ্টি। উড-এনগ্রেভিংয়ের সকল সম্ভাবনা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে।'[১৬] চিত্রটির আয়তন ১৬×১৯ সে. মি.। আনুভূমিক বিন্যাসে চিত্রটি নির্মিত। সাদা নির্মল কাগজে কালো কালিতে ছাপায় আলো ও ছায়ার উজ্জ্বলতা চমৎকার ও আকর্ষণীয়ভাবে উদ্ভাসিত। মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী বিন্যাস নির্মাণে বৈচিত্র্যময়তার যোজন লক্ষণীয়। গ্রামের লোকেরা মেলার উদ্দেশে বনের মেঠোপথ ধরে চলছে। দুটি গাছের গুড়ির মাঝখান দিয়ে ফ্রেমবন্দি করেছেন ঘোড়ার পীঠে চড়ে গোলপাতায় তৈরি ছাতা মাথায় একজন বণিকের মেলার উদ্দেশে যাত্রার দৃশ্যপট (চিত্র ৮)। ঘোড়ার পীঠে মেলায় বিক্রির জন্য আনুষঙ্গিক পণ্যসামগ্রী। গাছের গুড়ির খুব কাছাকাছি দিয়ে একটি ছোট কালো রঙের কুকুর ঘেউ ঘেউ করে পিছু চলছে। এছাড়াও ঘোড়ার সম্মুখপানে দুজন সাঁওতাল রমণী। একজনের মাথায় গোলপাতায় তৈরি ছাতি ধরা। তার পেছন পেছন হাঁটছে তার অবুঝ উলঙ্গ শিশুটি। 'সঙ্গী কুকুর আর মায়ের আঁচল ধরা নগ্ন শিশুটির রূপায়ণে শিল্পীর গভীর মমত্ববোধের প্রকাশ ঘটেছে'।[১৭] গাছের গুড়ির অনেকটা আড়ালে অপর জনের মাথায় প্রয়োজনীয় কোনো বস্তুসামগ্রী। গাছের গুড়িতে কিছুটা আড়ালে ও ঘোড়ার পেছনের পাশেই আরেক সাঁওতাল রমণী মাথায় ঘটি নিয়ে হেঁটে চলেছে সম্মুখপানে।

গাছের পিছন দিয়ে বলিষ্ঠ পদভারে সুঠাম দেহী ধূতি পরিহিত সাঁওতাল পুরুষ হেঁটে চলেছে। ধূতির আঁচল কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত। ধূতির আঁচলে খাড়া আঁচড়ে নকশা করা। তার কাঁধে মাটির কলসের ভারা। এর থেকে একটু দূরে পাশেই আরেক চলমান সাঁওতাল বালা। তার মাথায়ও ঘটি। সম্মুখপানে আরো দূরে গাছের ছায়ায় বিশ্রামরত একজন পথিক। পাশেই গরুরগাড়ির কাঠের চাকার এক চতুর্থাংশ লক্ষণীয় এবং পশ্চাৎপটে আরো দূরের পথে দুটি গরুরগাড়ির গন্তব্যে যাত্রার দৃশ্যও চিত্রপট থেকে বাদ পড়েনি। যাতে ছইয়ের নকশা বুনটে সূক্ষ্মতার ছাপ লক্ষণীয়।

মানুষ, প্রাণীদেহ, গাছ-গাছালি এবং অন্যান্য অনুষঙ্গের দেহাবয়বে রৌদ্রের তীব্র আলোক প্রক্ষেপণে ছায়া মেঠোপথ ও ঘাসের ওপর সুতীব্র গতিতে পড়েছে। আলোকিত অংশকে বিচিত্র নরুন বা বুলির সুকৌশলের কুশলী প্রয়োগ খোদাইয়ে কোথাও গাছের গুড়ির অংশকে ক্রস টোন, কোথাও ডট, কোথাও সরু ও মোটা ক্ষুদ্র ভঙ্গুর ও সরল রেখায় উদ্ভিন্ন করেছেন। বিন্দু বা ডট বুনটে ঘোড়ার অবয়ব পরিস্ফুট। ঘোড়ার দেহের পিছনের আলোকিত এবং চলমান সাঁওতাল পুরুষের আলোকিত অংশকে সলিড টোনে উদ্ভিন্ন করেছেন। ছাতার গোলাকার বৈশিষ্ট্য আনয়নে নরুনকে 'রাউন্ড সেইভ'-এ বা গোলাকার আকৃতিতে প্রয়োগ করে সুদক্ষতায় খোদাই করে অন্তর্ভেদ করেছেন। সাঁওতালদের কালো দেহে আলোক ছটায় শিল্পী সৌন্দর্যের আভা ছড়িয়ে দিয়েছেন। একই সঙ্গে গাছের পাতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেও উপেক্ষা করেননি। গাছের আলোকিত অংশে যে বুনট সৃষ্টি হয়েছে তাতে গাছের গুড়ির

---

[১৫] সৈয়দ আজিজুল হক, *সফিউদ্দীন আহমেদ*, পৃ. ৩৯।

[১৬] তদেব, পৃ. ঐ।

[১৭] আব্দুল মতিন সরকার, "শফিউদ্দীন আহমেদ", *ষড়ঙ্গ*, পৃ. ৬।

স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। গাছের পাতার দল এবং ঘাস ও মাটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুনটে অন্তর্ভেদ করে উদ্ভাসিত করেছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাসের পরিস্ফুটনে অপরিমেয় দক্ষতার ছাপ দৃশ্যায়িত হয়েছে। এই চিত্রের কাজের টেকনিক প্রসঙ্গে শিল্পী নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন এভাবে: 'আমার এত দিনের কাঠখোদাইয়ের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে প্রয়োগ করেছি'।[১৮] নিখুঁত ড্রইং, বলিষ্ঠ শিল্পকৌশল প্রয়োগে পুরোচিত্রটি নাটকীয় আলোছায়ায় সাদাকালোর পারস্পারিক দ্বন্দ্ব অধ্যাসে বাস্তবধর্মীরূপে সুস্পষ্ট এবং নান্দনিক শৈল্পিক অনুভূতির ক্রিয়ায় উচ্চমার্গীয় শিল্পের দ্যোতনায় পরিস্ফুটিত হয়েছে-যা এদেশের অন্য কোনো শিল্পীর ছাপাইকর্মে আজ অবধি বিরল। তাঁর এ সময়ের ছাপাই ছবি সম্পর্কে এই উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য:

> নিসর্গের আলো-আঁধারি ঘেরাটোপে মানুষ ও জীবনের অন্যসব অনুষঙ্গের ইঙ্গিতময়, প্রতীকময় উপস্থাপন তাঁর শিল্প-দৃষ্টির স্থির বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির মায়াবী প্রদেশে ধীর পদবিক্ষপে হেঁটে চলে মানুষ ও বন্ধু-প্রাণী গরু-মোষ। শিল্পীর চল্লিশের দশকের কাজে প্রাণী ও প্রকৃতির এই মধুর সমাচার আছে।[১৯]

চিত্র ৭ : শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদ, সাঁওতাল রমণী, উডএনগ্রেভিং

চিত্র ৮ : শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদ, মেলার পথে, উডএনগ্রেভিং, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ

তিন. বাংলাদেশে অবস্থানকালের উড-এনগ্রেভিং ছাপাই ছবির বিশ্লেষণ

স্বদেশের পটভূমিতে চল্লিশের দশকে কলকাতার গ্রামীণ সাঁওতাল জনজীবনের চালচিত্রের যে রূপ বোধে সিক্ত করেছিলেন পঞ্চাশের দশকের একটি উল্লেখযোগ্য উডএনগ্রেভিং মাধ্যমের কাজে তার প্রতিফলন লক্ষণীয়। এ দশকের চিত্রকর্মে বাংলাদেশের নদী-নালা, বন্যা ও প্রকৃতির দৃশ্যরূপ বাস্তবরূপে উডএনগ্রেভিং কৌশলে নির্মাণ করেন। এ সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য উডএনগ্রেভিং মাধ্যমের ছাপাইকর্ম হলো 'মুন্সিগঞ্জের নদীর দিকে' (১৯৫১)। এটি ৭×১৩ সে. মি. আয়তনে আনুভূমিকে

---

[১৮] মোঃ নাজির আহমেদ, *বাংলাদেশের কাঠখোদাই চিত্র ও আমার শিল্পভাবনা*, এম.এফ.এ. অন্তর্ভুক্ত অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত), চারুকলা ইনস্টিটিউট, লাইব্রেরি, বর্তমান চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), পৃ. ১৯।

[১৯] মইনুদ্দীন খালেদ, "সফিউদ্দিন: শুদ্ধতম ঋত্বিক", *বাংলাদেশের চিত্রশিল্প*, পৃ. ৩৭।

উপস্থাপিত। নদীর বুকে জেগে ওঠা চরের কিনারে বাঁশের খুঁটির সঙ্গে বাঁধা ডিঙি নৌকা। ধানক্ষেত পেরিয়ে দূরে তটরেখায় আকাশ দৃশ্যমান। নদীর চরের বসতি কৃষক কাঙ্ক্ষিত ফসল কেটে মাথায় নিয়ে নৌকাতে বোঝাই করছে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কৃষকের দেহের ছায়া পড়েছে নদীর স্বচ্ছ পানিতে। বৈচিত্র্যময় নরুনের দক্ষ প্রয়োগে সরু, মোটা, লম্বা রেখা আর বিন্দুতে নানা অনুষঙ্গ বাস্তবরূপ ধারণ করেছে (চিত্র ৯)।

সফিউদ্দীন আহমেদ উডএনগ্রেভিংয়ে বাস্তবধর্মী চিত্র ছাপাই করলেও অর্ধ-বিমূর্ত ধাঁচে 'জীবনের চিত্রকল্প' (১৯৫৫) শীর্ষক চিত্রটি ১৫×১৮ সে. মি. আয়তনে আনুভূমিকে নির্মাণ করেন (চিত্র ১০)। দুজন মাঝি গুণ টেনে যাচ্ছেন। তাদের যাত্রায় সমগ্রদেহে গতি সঞ্চার দৃশ্যমান। যাতে গুণটানার বলিষ্ঠতা সুচারুভাবে উদ্ভিন্ন প্রকাশ পেয়েছে। অনেকটা কিউবিক ধাঁচে মানুষের দেহগড়ন, প্রখর আলোছায়ায় নিটোলভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। জ্যামিতিক ফর্ম ও ছন্দায়িত রেখার গতি চিত্রের কোথাও কোথাও আলংকারিক ধাঁচে পাতা, ঘাস, নদীর ঢেউ–এসব অনুষঙ্গ ডট বা বিন্দু, ক্ষুদ্র রেখা বৈচিত্র্যময় টুলস প্রয়োগে সূক্ষ্মভাবে খোদাই করে কালো বর্ণে ছেপেছেন। মানবদেহের গড়নে জ্যামিতিক ফর্মের আদল, দুটি পাখি আকাশের পানে উড়ে যাচ্ছে। চিত্রের ইমেজকে কোথাও সাদা আবার কোথাও কালোয় পরিস্ফুট করেছেন সুদক্ষ কারিগরি কুশলতায়। মাঝি-মাল্লাদের কষ্টসাধ্য এই অমানুষিক গুণটানার দৃশ্য শিল্পীর মানবিক অনুভূতিকে ব্যাপকভাবে নাড়া দিয়েছে। তিনি তাদের এই দুর্বিষহ জীবনযাত্রার চিত্ররূপ কাঠের পরিতলে উদ্ভিন্ন করেছেন। সাদা কাগজে কালো বর্ণে চিত্রটি ছাপাইকৃত। কালোর মধ্যেও যে লালিত্য বিদ্যমান শিল্পী তার যথার্থ বহিঃপ্রকাশে প্রয়াসী হয়েছেন।

একই দশকে তিনি উডএনগ্রেভিং কৌশলে ছাপাই করেন 'বন্যা' (১৯৫৬) শীর্ষক ছাপাইকর্ম। এটি ১৫×২০ সে. মি. আয়তনে আনুভূমিকে নির্মিত। এ সময় এদেশে বন্যার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। শুধু তাই নয়, দেশের রাজধানী ঢাকাসহ আশেপাশের এলাকাও বন্যার করালগ্রাসে আক্রান্ত হয়। তখন তিনি পুরান ঢাকার স্বামীবাগ এলাকায় বসবাস করতেন। এই বন্যায় বেশিরভাগ সময় তিনি বাসাতেই অনেকটা বন্দিজীবন কাটান। প্রতিদিন তিনি প্রত্যক্ষ করছেন বন্যাক্রান্ত মানুষের দুর্বিষহ চলমান জীবনযাত্রা। চিত্রটিতে বন্যাক্রান্ত গ্রামীণ জনপদের বিচিত্ররূপ দৃশ্যমান হয়েছে (চিত্র ১১)। বন্যার করালগ্রাসে ভাসমান মানুষজন নৌকায় করে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করে গন্তব্যে যাচ্ছে। ঘর-বাড়ি, নৌকা, বৃক্ষ, মানুষজনকে কালোতে রেখে শুধু রেখাপ্রধান বৈশিষ্ট্যে সূক্ষ্মভাবে সাদা বর্ণে ড্রইংগুলো বলিষ্ঠতায় উদ্ভাসিত করেছেন। সাঁওতাল দুমকা অঞ্চলের রাঢ়ভূমির শুষ্কতা এখানে নেই, আছে বন্যার জলে সৃষ্ট কাদাযুক্ত ভূমি। বানের জলে ভাসমান কুঁড়েঘর আর বৃক্ষরাজির সম্মিলন, নৌকায় মানুষজনের গন্তব্যে সচল যাত্রা। প্রকৃতির এরূপ নিটোল চিত্রকে শিল্পী নরুনের কুশলী প্রয়োগে সাদাকালোয় ছেপেছেন। প্রতিটি প্রাণী ও বস্তুর গড়ন বাস্তবরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

সফিউদ্দীন আহমেদের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের উডএনগ্রেভিং কৌশলে ছাপাইকৃত প্রতিটি বাস্তবধর্মী চিত্রকর্ম সাদা জমিনে কালো রঙে উদ্ভাসিত হওয়ায় সাদাকালোর দ্বন্দ্বে আলোছায়ার গড়ন নান্দনিক উদ্ভাসনে চিত্রভাষা পেয়েছে। এ সময়ের প্রায় প্রতিটি ছাপাইকর্মে ব্রিটিশ চিত্রকর বেউইক-এর শিল্পধাঁচের বাস্তবরূপ বিদ্যমান। বিশেষত উডএনগ্রেভিং ছাপাইকর্মে প্রকরণপ্রয়োগের প্রকটতা লক্ষণীয়ভাবে উদ্ভাসিত। এ সময়ের প্রতিটি কাজেই বাস্তবতার চিত্ররূপই প্রকাশ পেয়েছে। এক্ষেত্রে শিল্পবিদগ্ধজন বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের এই ভাষাটি এখানে উল্লেখ করা যায়:

> উড এনগ্রেভিং প্রত্যক্ষতা শফিউদ্দীনের মেজাজকে স্ফূর্তি দিয়েছে। তিনি উপাদানের টেক্‌চারে পুরো সুযোগ নিয়েছেন, সারফেসের বেশ অংশ না খোদাই করে ফ্ল্যাট রেখে দিয়েছেন তাঁর নরুণের দক্ষতা ও কাঠের কর্কশতার সঙ্গে বিরোধাভাস তৈরির জন্য। শুধু

অনিবার্য বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খতা, অথচ বাহুল্য ছাঁটাই করেছেন নির্মম হাতে, দীপ্ত করে তুলেছেন বিষয়টি, সাঁওতাল জীবন যাত্রা রেখায় রেখায় গতিমান তাদের ভঙ্গি।[২০]

চিত্র ৯ : শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদ, মুন্সিগঞ্জের নদীর দিকে, উডএনগ্রেভিং, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ

চিত্র ১০: শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদ, জীবনের চিত্রকল্প, উডএনগ্রেভিং, ১৯৫৫

চিত্র ১১ : শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদ, বন্যা, উডএনগ্রেভিং, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ

উপসংহার

শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদের উড-এনগ্রেভিং ছাপাইকর্মের বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা অনুধাবন করতে পারি, সুনিপুণ কারিগরি আর অপরিমেয় বিষয়বৈচিত্র্যে শৈল্পিক ছোঁয়া এবং সাবলীল অঙ্কনশৈলী ও কম্পোজিশনে স্বকীয় শিল্পভাষা যোজিত হয়ে এক অবিস্মরণীয় শিল্পের সৃজন হয়েছে, তাঁর উড-এনগ্রেভিং কৌশলের বাস্তবধর্মী চিত্রবলয়ে। তাঁর উড-এনগ্রেভিং চিত্রসম্ভারে কালো রঙের গভীরতা কতটা ছন্দোময়, তাৎপর্যবহ দ্যোতনা তৈরি করতে পারে, তারই প্রমাণ মেলে। পাশ্চাত্য শিল্পধারার শিল্পী র‍্যামব্রান্ট (১৬০৬-১৬৬৯) তাঁর ছাপাইকর্মে যে কালো রঙের সার্থক প্রয়োগ করেছিলেন সেই শিল্পরীতি দ্বারা সফিউদ্দীন অনেকটা প্রলুব্ধ হয়ে স্বকীয় শিল্পধারায় বিষয়বৈচিত্র্য, আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যে ও বিচিত্রগামী কৌশল প্রয়োগে তাঁর শিল্পভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে শিল্পধারায় দীক্ষাপ্রাপ্ত হলেও সফিউদ্দীনের স্বতন্ত্রধারার উডএনগ্রেভিং প্রকরণের ছাপাই ছবিগুলো এদেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক শিল্পের মানদণ্ডে উন্নীত হয়েছে – তাই তাঁকে আন্তর্জাতিক ছাপচিত্রী হিসেবে চিহ্নিত করতে আমাদের কোনো ধরনের কুণ্ঠাবোধ হয় না। শুধু তাই নয়, তাঁর বাস্তবধর্মী চিত্রভাষার গড়ন বিনির্মাণ, স্বকীয় অন্তর্লীন শৈল্পিক রসাস্বাদনে এক অভিনব শিল্পের মেলবন্ধন যোজনা করেছে- যা বাংলাদেশের বর্তমান প্রজন্মের ছাপাই শিল্পীদের ক্ষেত্রে বিশেষত উডএনগ্রেভিং ছাপাই কৌশলের এক চরম উৎকর্ষের দিকনির্দেশনা।

---

[২০] বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, "শফিউদ্দীন আহমেদ", *চিত্রশিল্প : বাংলাদেশের*, পৃ. ৪৭-৪৮।

আইবিএস-এর কয়েকটি প্রকাশনা

১৯৯১ সফর আলী আকন্দ সম্পাদিত। *বাঙালীর আত্মপরিচয়*।

১৯৯২ আবদুল করিম। *বাংলার ইতিহাস: মোগল আমল*।

২০০৯ মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার সম্পাদিত। *প্রীতিকুমার মিত্র স্মারকগ্রন্থ*।

২০১০ মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার সম্পাদিত। *বিশ শতকের বাংলা*।

২০১২ মাহবুবর রহমান সম্পাদিত। *রাজশাহী মহানগরী: অতীত ও বর্তমান*। ২ খণ্ড।

২০১২ শাহানারা হোসেন। *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস*।

২০১৫ স্বরোচিষ সরকার সম্পাদিত। *বাংলাদেশের ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনা*।

২০১৫ স্বরোচিষ সরকার সম্পাদিত। *জাগরণ ও অভ্যুদয়*।

২০১৫ মোহাম্মদ নাজিমুল হক সম্পাদিত। *বরেন্দ্র অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আচার-অনুষ্ঠান*।

২০১৫ *বাংলাদেশ চর্চা দেশে বিদেশে: সটীক গ্রন্থপঞ্জি* সিরিজ (মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা, সাহিত্য)।

1983 S A Akanda edited. *The District of Rajshahi: Its Past and Present*.

1991 Abdul Karim. *History of Bengal: Mughal Period*. 2 Volumes.

2010 Md. Shahajahan Rarhi. *Index to the Journal of IBS* (1976-2009).

2011 Shahanara Husain. *History of Ancient Bengal*: Selected Essays on State, Society and Culture.

2015 *Bangladesh Studies Home and Abroad*: *Annotated Bibliography* Series (Economics, Society, Law, Statistics, Trade and Commerce, and Education).